গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১৩ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

বিজেপির চাকরি দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত নিন্দনীয়

এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিজেপি যেভাবে এই রাজ্যে ৭৫ লক্ষ যুবককে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কার্ড ছাপিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে তা অত্যন্ত আপত্তিকর ও নিন্দনীয়। এই প্রতিশ্রুতি যে কেবল ভোটের জন্য এবং তার যে অন্য কোনও মূল্য নেই তা সকলেই বোঝেন। প্রত্যেক ভোটের আগে বিজেপি যে এমন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, তা কারও অজানা নয়। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা বা বছরে ২ কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে পরবর্তীকালে তাঁদের নেতারাই 'জুমলা' বলেছিলেন।

এর আগে মধ্যপ্রদেশে বছরে ১০ লক্ষ, রাজস্থানে ৫০ লক্ষ, মহারাষ্ট্রে মোট ৫ কোটি এবং সদ্য সমাপ্ত বিহারের ভোটের আগে বছরে ১৯ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন। আমরা ভোটের আগে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ধোঁকা দেওয়ার এই দেউলিয়া রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার ও তা বর্জন করার আহ্বান করছি।

সব রাস্তা মিলছে গিয়ে দিল্লিতে

'দেখি, কতদিন সরকার জনগণের দাবি অবহেলা করতে পারে!'

শাহজাহানপুরের অবরোধে কমরেড সত্যবান

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অনড় মনোভাবের সামনে দাঁড়িয়ে দেশের কৃষকরা আন্দোলনকে আরও জোরদার, আরও বিস্তৃত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও মতেই কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবি মানতে রাজি নয়। তাই কৃষকদের সাথে দফায় দফায় বৈঠকে কোনও ফল হয়নি। দাবি আদায়ের সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। এবার আরও বেশি সংখ্যায় কৃষকদের সমাবেশ ঘটিয়ে দিল্লি ঢোকার অন্যান্য জাতীয় সড়কগুলিও বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তাঁরা। সারা ভারত কিষান সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটির (এআইকেএসসিসি) নেতারা জানিয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আরও অসংখ্য কৃষক সিংঘু, টিকরি, গাজিপুর, পালওয়ালে এসে জড়ো হচ্ছেন।

রাজস্থান থেকে আসা হাজার হাজার কৃষক ১৩ ডিসেম্বর দিল্লি ঢুকতে গেলে হরিয়ানা পুলিশ তাঁদের বর্ডারে আটকে দেয়। কৃষকরা শাহজাহানপুরে রাজস্থান-দিল্লি হাইওয়ে আটকে সেখানেই অবস্থান শুরু করে দেন। এর ফলে সিংঘু, টিকরি, গাজীপুরের পর দিল্লি ঢোকার আরও একটি জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হল। এখানকার সমাবেশে দাঁড়িয়ে এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান বলেন, যতদিন যাবে তত বেশি সংখ্যায় কৃষকরা দিল্লিতে এসে জড়ো হবেন। সরকারের কোনও লাঠি-গুলি, জলকামান তাদের হঠাতে পারবে না। তিনি বলেন, আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। কত দিন সরকার কৃষকদের দাবি অবহেলা করতে পারে সেটাই কৃষকরা দেখতে চায়। অবরোধে উপস্থিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, আন্দোলনে বিভেদ তৈরির কোনও চেষ্টা সফল হবে না। প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে অপেক্ষা করতে করতে কখন কৃষকরা ফিরে যান— সরকার সেই অপেক্ষায় আছে। কিন্তু সরকারের সে আশা পূরণ হবে না। জন আন্দোলনের পরিচিত নেত্রী মেধা পাটকর বলেন, গোটা কৃষিব্যবস্থাটিকে কয়েক জন একচেটিয়া পুঁজিপতির হাতে তুলে দিতেই নয়া কৃষি আইন এনেছে সরকার। বক্তব্য রাখেন যোগেন্দ্র যাদব প্রমুখ নেতারাও।

প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের সাথে কথা বলার সময় পাচ্ছেন না। বণিকসভার মঞ্চ দাঁড়িয়ে গুণগান করে আসছেন কৃষি আইনের। কৃষি এবং বিদ্যুৎ আইনের ফলে কত বিনিয়োগ আসবে তার লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছেন। বণিকরা হাততালি দিচ্ছেন। এই অবস্থায় দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন আরও জোরদার করা ছাড়া কৃষকদের সামনে অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই। সেই রাস্তাই নিয়েছেন কৃষকরা। যত দিন যাচ্ছে ততই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশ জুড়ে। পাঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশ থেকে নতুন করে কৃষকরা কয়েক হাজার ট্রাক্টরে চেপে অবস্থানে আসছেন, তেমনই রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু

১৩ ডিসেম্বর শাহজাহানপুর অবরোধে বক্তব্য রাখছেন কমরেড সত্যবান

দুয়ের পাতায় দেখুন

কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে রাজ্যের কৃষকরাও সোচ্চার

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে দেশব্যাপী সমস্ত রাজ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকেও আন্দোলনের ঝাণ্ডা নিয়ে ধর্নামঞ্চে সামিল অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস)। ধর্নামঞ্চের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ধর্নাস্থলে এসে বহু মানুষ, বহু সামাজিক সংগঠন সংহতি জানিয়ে যাচ্ছেন। ১৪-১৫ ডিসেম্বর কলকাতায় এসপ্ল্যানেডের ওয়াই চ্যানেলে ধর্নামঞ্চের উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য নেতা কমরেড গোপাল বিশ্বাস। এই অবস্থানে এসে সংহতি জানায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকাও। যে বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী)-২০২০ বাতিলের দাবিতে অ্যাবেকা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করছে, দিল্লির কৃষক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি সেই আইন প্রত্যাহার। কারণ এই আইনে বিদ্যুৎকে পরিষেবার পরিবর্তে পণ্য করা হয়েছে। ফলে দাম বাড়বে মাত্রাছাড়া। সঙ্গত কারণেই আন্দোলনে কৃষক-বিদ্যুৎগ্রাহক মৈত্রী গড়ে উঠছে।

মেছেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

বাঁকুড়া ঃ সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কমিটি শহরের কেন্দ্রস্থল মাচানতলায় ১০-১২ ডিসেম্বর প্রতিবাদী ধর্নামঞ্চ চালায়। বাঁকুড়া শহর ও পার্শ্ববর্তী দুটি ব্লক, শালতোড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, সিমলিপাল ও সারেঙ্গা থেকে সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা ধর্নামঞ্চে যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি কমরেড দিলীপ কুণ্ডু, বিদ্যুৎ শীট সহ অন্যান্য কৃষক নেতৃবৃন্দ। কৃষক আন্দোলনের

পাঁচের পাতায় দেখুন

সব রাস্তা মিলছে গিয়ে দিল্লিতে

একের পাতার পর

প্রভৃতি রাজ্যগুলি থেকেও হাজার হাজার কৃষক আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন। ১২ ডিসেম্বর সারা দেশে কয়েক হাজার টোলপ্লাজায় অবরোধ করেন কৃষকরা। রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর বিভিন্ন সুপার

দিল্লির টিকরি সীমান্তে কৃষকদের অবস্থানে বক্তব্য রাখছেন এআইকেকেএমএস সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ

মার্কেটের সামনে কৃষক বিক্ষোভ হয়। ১৪ ডিসেম্বর সারা দিন অনশনের কর্মসূচি করেছেন আন্দোলনের নেতারা। এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে সারা দেশে এই মুহূর্তে ৩০০টির বেশি জায়গায় লাগাতার কৃষকদের ধরনা মঞ্চ চলছে। আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলা, ঝাড়খণ্ড, বিহার ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কেরালায় ধরনা মঞ্চে মানুষের অংশগ্রহণ খুবই উল্লেখযোগ্য। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বেশি সংখ্যায় কৃষক এবং সাধারণ মানুষকে ধরনাগুলিতে যুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। গড়ে তোলা হচ্ছে আন্দোলনের কমিটি।

সিংঘু, টিকরি, পালওয়াল, গাজিপুর প্রভৃতি সব ধরনার জায়গাতেই লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে ২৬ নভেম্বর থেকে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন পরিবারের মহিলা, শিশু, বৃদ্ধরা পর্যন্ত। ট্রাক্টরে ত্রিপল টাঙিয়ে, কোথাও ট্রাক্টর কিংবা লরির তলায় মাটিতেই ঘুমোচ্ছেন তাঁরা। লক্ষ লক্ষ কৃষক পারস্পরিক সহযোগিতার এক অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করেছেন এই আন্দোলনে। আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে বুঝেই কৃষকরা সঙ্গে করে এনেছেন বেশ কয়েক মাসের খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই সব কিছুই তাঁরা তুলে দিচ্ছেন পাশে থাকা আন্দোলনের সাথীদের হাতে। আশপাশের এলাকাগুলি থেকেও সাধারণ মানুষ কৃষকদের জন্য রান্নাকরা খাবার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র প্রতিদিন ম্যাটাডোরে, গাড়িতে করে এনে দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষ নিজেদের উদ্যোগে খাবার, শীতবস্ত্র প্রভৃতি বিলি করছেন। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসকরা আন্দোলনকারীদের চিকিৎসার জন্য শিবির খুলেছেন। প্রয়োজনীয় ওষুধ, অন্যান্য সরঞ্জাম সবই সাধারণ মানুষ জোগাচ্ছেন। সারা দেশই আজ মানসিক ভাবে কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিক-ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনগুলি আন্দোলনের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সংহতি জানিয়েছেন। ফলে দিন যত যাচ্ছে ততই যেন কৃষকরা দাবি আদায়ে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছেন। কৃষক আন্দোলন ধীরে ধীরে গণআন্দোলনের রূপ নিচ্ছে।

এই অভূতপূর্ব ঐক্য এবং অনমনীয় মনোভাব দেখে ভয় পেয়েছে সরকার। আম্বানি-আদানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজির কাছে দাসখত লিখে দেওয়া বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা আন্দোলন ভাঙতে কুৎসা রটাতে শুরু করেছেন। কখনও বলছেন এই কৃষকরা আসলে খলিস্তানি, কখনও বলছেন পাকিস্তানি, কখনও বলছেন, আন্দোলনের দখল নিয়েছে অতিবামরা। এ থেকেই স্পষ্ট শাসক বিজেপি কৃষি আইনের পক্ষে দেশের মানুষের সামনে কোনও যুক্তিই রাখতে পারছে না— যা বিশ্বাসযোগ্য। সরকারের এই বিভ্রান্তিকর প্রচারে অবশ্য কৃষকদের কিছু যায়-আসে না।

প্রবল শীতের মধ্যে এভাবেও দিন কাটাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা

আন্দোলনকারী কৃষকদের হাতে
কমরেড প্রভাস ঘোষের লেখা ভগৎ সিং-এর জীবনসংগ্রাম

তাঁরা এটা স্পষ্ট বুঝেছেন, পিছু হঠার কোনও জায়গা নেই। এই আইন চালু হলে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন। ফলে আন্দোলনের ময়দান জুড়ে এখন একটাই স্লোগান— হয় জয়, না হয় মৃত্যু। বাস্তবিকই কৃষকদের কাছে যেমন, তেমনই দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছেও এটা অস্তিত্বের সংগ্রাম। লড়াইটা তাই চলবেই।

আন্দোলনে মহিলারাও যোগ দিয়েছেন বিপুল সংখ্যায়

জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি) পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট প্রবীণ সংগঠক, পুরুলিয়া মফঃস্বল লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড সুধীর মাহাত ৬ ডিসেম্বর আকস্মিকভাবে সাঁওতালডির মধুডি গ্রামে তাঁর নিজ বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

গত শতকের ৭০-র দশকের প্রথমার্ধে কমরেড সুধীর মাহাত চাকরি পেয়ে রাজ্য সরকারি বিদ্যুৎ দপ্তরের পুরুলিয়া শহর সংলগ্ন বোঙ্গাবাড়ি সাবস্টেশনে যোগ দেন এবং সেখানেই সরকারি কোয়ার্টারে থাকতে শুরু করেন। তার কিছুদিন পরে দলের তৎকালীন পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ কর্মোপলক্ষে সেখানে আসায় কমরেড সুধীর মাহাত ধীরে ধীরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এই সময়েই তিনি কমরেড স্বপন ঘোষের মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সন্ধান পান ও মনপ্রাণ দিয়ে সংগঠনের কাজে যুক্ত হন। মূলত তাঁর হাত ধরেই পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দলের সংগঠন গড়ে ওঠে। সেই সময় সেখানে কয়েকটি ছোট ছোট কারখানা ছিল। দলের নেতৃত্বে সেগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটি আন্দোলনেই কমরেড সুধীর মাহাত-র সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাছাড়া এই এলাকায় ছোট বড় নানা গণআন্দোলন তাঁর উদ্যোগে পরিচালিত হয়েছে। বিদ্যুৎ কর্মীদের আন্দোলনেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

সাধারণ মানুষের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলার ও তাদের একান্ত আপনজন হয়ে ওঠার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও তিনি দলের আদর্শকে নিয়ে গেছেন এবং তাঁদের কর্মী ও সমর্থকে পরিণত করেছিলেন। দলের কর্মীদের জন্য তাঁর ঘরের দরজা ছিল সবসময় খোলা।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ি সাঁওতালডির মধুডিতে ফিরে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। নানা কারণে আগের মতো সক্রিয় না থাকতে পারলেও সাঁওতালডিতেই দলের কাজের সাথে শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন অভিজ্ঞ কর্মীকে, আর সাধারণ মানুষ হারাল তাদের প্রিয়জনকে।

কমরেড সুধীর মাহাত লাল সেলাম

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের ঝাঁটিপাহাড়ী গ্রামের প্রবীণ কর্মী কমরেড অশোক কুণ্ডু ৭ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র কমরেড শিশির সিংহবাবু, কমরেড দোলগোবিন্দ রক্ষিত, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন নাগ এবং কৃপাসিন্ধু কর্মকার তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। জেলা সম্পাদকের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড স্বপন নাগ।

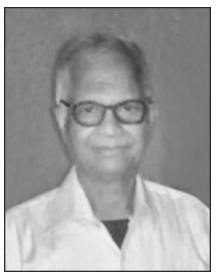

কমরেড অশোক কুণ্ডু আটের দশকের শুরুতেই এস ইউ সি আই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বরাবরই পার্টির নানা কাজে সহযোগিতা করেছেন। নিজেও অনেক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর বাড়িতে ছিল কমরেডদের অবাধ যাতায়াত। দলের নীতি, আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। পরিবারের সদস্যদের দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সর্বদা দলের কাজকর্ম ও কমরেডদের খোঁজখবর রাখতেন। দলের পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পাঠে তাঁর ছিল বিশেষ উৎসাহ। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ সমর্থককে।

কমরেড অশোক কুণ্ডু লাল সেলাম

জাতীয় শিক্ষানীতিতে
শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণের ঝোঁক বিপজ্জনক

প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ রচিত হয়েছে ২১ শতাব্দীর ডিজিটাল যুগ ও বাজার অর্থনীতির উপযোগী কর্মশক্তি তৈরি করার দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই এবারের শিক্ষানীতিতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার উপরে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃত্তিমুখী শিক্ষা শুরু হবে একদম স্কুল স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিচিত পরিবেশ, সম্পদ ও স্থানীয় পেশার সাথে যুক্ত প্রশিক্ষককে কাজে লাগানো হবে। প্রশ্ন হল, মাত্র ১২ বছর বয়সে একজন কিশোর বা কিশোরী কিভাবে শিক্ষার পাঠ্যক্রমথেকে তার বৃত্তি (ভোকেশন) বা পেশা নির্বাচন করবে? সেই অভিজ্ঞতা বা পরিপক্কতা কি তার গড়ে উঠেছে? স্বাভাবিকভাবে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ও মফঃস্বলের সরকারি ও বিশেষত সরকার পোষিত হাজার হাজার স্কুলে একদিকে উপযুক্ত পরিকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব অন্যদিকে জাতপাত ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ও চূড়ান্ত আর্থিক বৈষম্যে বিভাজিত এ দেশের অধিকাংশ তথাকথিত নিম্নবর্ণ এবং প্রান্তিক সমাজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পারিবারিক পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ কুমোরের ছেলেকে কুমোরের কাজ, কামারের সন্তানকে কামারের কাজ, মালির সন্তানকে বাগানের কাজ, ছুতোর মিস্ত্রির সন্তানকে ছুতোরের কাজ, তাঁতির ছেলেকে তাঁত বোনা শিখেই দিন গুজরান করতে হবে! তাদের বৃহত্তর জগতের অন্য পেশায় যাওয়ার রাস্তাটা বন্ধ হবে। এবারের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে বছরে অন্তত দশটা দিন তারা স্কুল ব্যাগ ছেড়ে দিয়ে স্থানীয় চাষি বা মালি, ইলেকট্রিক এবং ছুতোর মিস্ত্রি, তাঁতি, কুমোর অথবা কামার বা রাজমিস্ত্রির কাছে গিয়ে হাতেকলমে কাজ শিখবে। ছুটির দিনগুলোতেও তাই। কারণ এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী, এরাই হচ্ছেন স্থানীয় প্রশিক্ষক। ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ যাদের দু'বেলা ভালো করে আহার জোটে না, তাদেরও নাকি অনলাইনে বৃত্তিমুখী শিক্ষা দেওয়া হবে পুরো স্কুল ব্যবস্থায় এটাই চলবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত (জাতীয় শিক্ষানীতির দলিল অনুযায়ী Clause.১৬.৫) ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% ছাত্রছাত্রীকে পুরোপুরি বৃত্তিমুখী শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হবে। আগামী দিনে এরাই নাকি হবেন প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের 'আত্মনির্ভর' ভারতের প্রধান শক্তি।

বৃত্তিমুখী শিক্ষার উপরে মাত্রাতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে দেশের একটা বিশাল অংশের ছাত্র-ছাত্রী মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাবে। মূল ধারার শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে দেশের অধিকাংশ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া অংশের ছাত্র সমাজের উচ্চশিক্ষা, উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে সুযোগ থাকবে না। কারণ উচ্চস্তরের বা উন্নত (স্নাতক স্তরের) পেশাগত শিক্ষায় (professional education) প্রবেশ করতে গেলে অন্তত উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। ডিপ্লোমা স্তরের পেশাগত শিক্ষায় প্রবেশ করতে গেলে অন্তত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এমনকি আইটিআই বা বিভিন্ন অ্যাপ্রেনটিসশিপ কোর্সে প্রবেশ করতে গেলে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এ বারের শিক্ষানীতিতে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল। একটা স্তর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পর একজন ছাত্রের বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ নেওয়া এক জিনিস, আর পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে বৃত্তিমুখীকরন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অত্যন্ত বিপদজনক ঝোঁক। এর ফলে ন্যূনতম সাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে গরিব সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা ও উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন দেখতে পারত তা গড়েই উঠবে না। শিক্ষার উচ্চপ্রাথমিক স্তরেই সেই মনটাকে মেরে দেওয়ার বন্দোবস্ত এবারের জাতীয় শিক্ষানীতিতে করা হয়েছে। কারণ যথার্থ ও উন্নত সাধারণ শিক্ষা (decent general education) সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভিত গড়ে তুলতে সাহায্য এবং আগ্রহ সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে আগামী দিনে সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল শিক্ষাকে সমস্ত যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে উন্নত ও শক্তিশালী করা। প্রয়োজন ছিল সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে শিক্ষকের লক্ষ লক্ষ খালি পদ যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করা ও পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার মানকে উন্নত করার জন্য সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সরকারি ব্যবস্থাতেও যে উন্নত শিক্ষা সম্ভব, তা দিল্লির সাম্প্রতিক স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা গেছে। তা না করে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে গরিব ছাত্রদের স্কুলের সাধারণ শিক্ষা থেকে দূরে হঠানোর আয়োজন সম্পূর্ণ করেছেন। ফলে আগামী দিনে আমরা দেখতে পাব জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যে ভরা আমাদের দেশে শিক্ষায় আরেক ধরনের বিভাজন বা বৈষম্য। সাধারণ স্কুলগুলোতে গরিব ছাত্ররা যখন ছোট ছোট অপটু হাতে বই ছেড়ে রাজমিস্ত্রির কর্নিক, ইলেকট্রিক মিস্ত্রির যন্ত্র, কিংবা ওয়েল্ডিং যন্ত্রের হাল ধরবে, তখন অবস্থাপন্ন ঘরের ছাত্রছাত্রীরা বেসরকারি পাঁচতারা স্কুলগুলোতে কম্পিউটারের সামনে বসে আধুনিক শিক্ষালাভ করছে, বিশেষ কোচিং নিয়ে ইলেকট্রিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইনজীবী অথবা ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এটাই হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'হার্ভার্ড শিক্ষা

ছয়ের পাতায় দেখুন

নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের আন্দোলন
কোনও নেতার রাজনৈতিক ঘুঁটির চাল নয়

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের কথা আজ উচ্চারিত হচ্ছে দিল্লি-হরিয়ানার সীমান্ত এলাকা সিংঘুতে। শুধু সেখানেই বা কেন বলি, এ নাম বারবার উচ্চারিত হচ্ছে দিল্লি সীমান্তে আছড়ে পড়া কৃষক বিক্ষোভের সর্বত্র। নামদুটি বারবার উচ্চারিত হয় পরম শ্রদ্ধায়, ভারত সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে।

গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ যে দৈত্যাকার করপোরেট কোম্পানির অর্থশক্তি আর তার দোসর সরকারি পেশি শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ধরে তা দেখিয়ে দিয়েছে এই দুই আন্দোলন। তাই কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে ভোট-লোভী নানা রাজনৈতিক দল এই দুটি আন্দোলনের গুরুত্বকে কমিয়ে দেখাতে চায়, তাকে হেয় করার চেষ্টা করে। আর এক দল চেষ্টা করে আন্দোলনের উত্তাপে জল ঢেলে তাকে ভোটবাক্সে বন্দি করতে।

ঠিক এমন একটি চেষ্টা সম্প্রতি দেখা গেল ১১ নভেম্বর নন্দীগ্রামে 'অপারেশন সূর্যোদয়'-এর প্রতিরোধের ১৩ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। রাজ্যের বর্তমান শাসক তৃণমূল কংগ্রেস দলের দুই গোষ্ঠী মেতে উঠল নন্দীগ্রাম আন্দোলনের গৌরবকে নিজের ভোটস্বার্থে কাজে লাগাতে। নন্দীগ্রামে সেদিন সভা হল দুটি। গোটা নন্দীগ্রাম ছেয়ে গেল নেতা-নেত্রীদের ছবির কাট আউটে। সংবাদমাধ্যমের গাড়ি ধুলো উড়িয়ে ছুটল নেতা-মন্ত্রীদের পিছনে পিছনে। নেতারা সব কতই না বক্তৃতা দিলেন, বললেন, অমুক নেতা অথবা নেত্রী না থাকলে নন্দীগ্রামকে উদ্ধার করত কে? কিন্তু ধর্ষক পুলিশ আর গুণ্ডা বাহিনীর নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হতে হতেও তাদের রুখেছিলেন যে বীর নারীরা, শহিদদের পরিবার যাঁরা সেদিনের স্মৃতি বহন করছেন, তাঁরা রয়ে গেলেন আড়ালে। সংবাদমাধ্যম ফলাও করে লিখল, কোন নেতার ডাকে কত লোক জমায়েত হয়েছে। কে বড়? তার ফয়সালা নাকি হবে ভোটের বাক্সে! অথচ নন্দীগ্রাম যেদিন জীবন বাজি রেখে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে নেমেছিল, সেদিন কোনও ভোটের হিসাব তো সে করেনি! আজ তাকে ভোটের ঘুঁটি করে দেওয়া হচ্ছে। মানবে কী করে নন্দীগ্রাম!

২০০৭-এ তদানীন্তন সিপিএম সরকারের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার বহুজাতিক পুঁজি সালেম গোষ্ঠীর এসইজেড গড়ে তোলার জন্য ৪০ হাজার একর জমি দখলের প্রস্তুতি। একই সাথে শুরু হয় জনগণের প্রতিরোধ। গড়ে ওঠে 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ তাতে সামিল হন। শাসক সিপিএম সালেম গোষ্ঠীর লেঠেল বাহিনীর ভূমিকায় নামিয়েছিল তাদের কর্মী-সমর্থকদের। তাদের আক্রমণে নন্দীগ্রামের তিনজন কৃষক নিহত হন। গ্রামের পর গ্রাম ঘিরে চলতে থাকে হাড় হিম করা সন্ত্রাস। শাসকদল এবং পুলিশের মদতে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, বোমাবাজি, গুলি, নারীর ইজ্জতহানি চলতেই থাকে। জনগণও রাস্তা কেটে, ব্যারিকেড তৈরি করে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। ১৪ মার্চ পুলিশ আর শাসকদলের পোষা গুণ্ডা বাহিনী শান্তিপূর্ণ জমায়েতের উপর গুলি চালিয়ে ১৪ জনকে হত্যা করে। প্রতিরোধ ভাঙতে গ্রামে গ্রামে তারা গণধর্ষণের মতো বর্বর পথ নেয় তারা। এরপর কখনও তারা পাঠিয়েছে দিল্লির জামা মসজিদের ইমামকে, মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনগণকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। কখনও তারা আন্দোলনের উপর মাওবাদী তকমা লাগাতে চেয়েছে। কিন্তু কোনও চক্রান্তই সফল হয়নি। নন্দীগ্রাম আন্দোলন শুধু রাজ্যের শাসক সিপিএম নয়, কেন্দ্রের কংগ্রেস, সেই সময়কার বিরোধী বিজেপি সকলেরই মুখোশ খুলে দিয়েছিল। নন্দীগ্রাম শিখিয়েছে, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আর ভোটের স্বার্থে বাজার গরম করার জন্য লোক দেখানো আন্দোলনের ফারাক কোথায়। 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'র তিনজন প্রধান নেতা, ভবানী দাস, নন্দ পাত্র, আবু সুফিয়ানদের দুজন এস ইউ সি আই (সি), একজন তৃণমূল করতেন। কিন্তু এই আন্দোলনে তাঁরা রাজনৈতিক পরিচয়ে সামনে আসেননি। বস্তুত সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম দুটি ক্ষেত্রেই আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রথম থেকেই গণকমিটি গড়ে তুলে ব্যাপক সংখ্যার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিল এই দল। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে আন্দোলনকে নেতাদের রাজা উজির বানাবার পথ হিসাবে ব্যবহার করার জঘন্য রাস্তা এই দল কোনও দিন নেয়নি। তাই সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম লড়াইয়ের এই জোর পেয়েছে। দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস এই আন্দোলনে এসেছে অনেক পরে। প্রথমে তাদের স্থানীয় নিচুতলার কর্মী সমর্থকরা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠার পর সংবাদমাধ্যমকে সাথে নিয়ে নামী-দামি নেতারা পৌঁছেছেন। ফলে মাটিতে থেকে যারা লড়ছিল, তারা চলে গেছে পিছনে। আর সংবাদমাধ্যম দেখিয়েছে যেন বাইরে থেকে আসা এই সব নেতাদের ম্যাজিকেই সব হয়েছে!

২০১১-তে ভোটে জেতার পর শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস নন্দীগ্রাম- সিঙ্গুরের আন্দোলনকে তাদের ক্যারিশমা প্রচারের হাতিয়ার করেছে। নন্দীগ্রামের অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের প্রমোশন দিয়ে নিজেদের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করেছে। সিপিএম সরকার জনগণের বিরুদ্ধে যে সব মিথ্যা মামলা করেছিল সেগুলি প্রত্যাহারেও তাদের অনীহা দেখা গেছে।

আজ নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর উভয় আন্দোলন নিয়েই শাসকদলের অভ্যন্তরের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিয়ে ব্যাপক প্রচার দিচ্ছে সংবাদমাধ্যম। এই পথে যত এই দুই আন্দোলনের মহত্ত্বকে খাটো করা হচ্ছে, তত সুকৌশলে জোরদার করা হচ্ছে কর্পোরেট স্বার্থের সেই প্রচার— সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামকে সরকার দখল করতে পারলেই নাকি সোনা ফলত বাংলায়! অথচ সেই সময় বাংলার জাগ্রত বিবেক এই সমস্ত অসার যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেখিয়েছিল, কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ মানে উন্নয়ন নয়। সারা ভারতে জমি অধিগ্রহণ আইন পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন। এই সংগ্রামের জয়কে ভুলিয়ে দিতেই নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের আন্দোলনকে তৃণমূলের এক এক জন নেতা-নেত্রীর রাজনীতির দাবার ছকের ঘুঁটি হিসাবে উপস্থিত করা হচ্ছে। এই অপচেষ্টা নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর তথা গোটা বাংলা মানতে পারে না।

মিড ডে মিল কর্মীরা আন্দোলনে

সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা প্রভৃতি দাবিতে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কর্মীরা ৬ ডিসেম্বর হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার ভক্তার মোড়ে ও মুন্সির হাট সহ নানা জায়গায় সভার আয়োজন করেন। ভক্তার মোড়ে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সংগঠক শ্যামল রাম, জেলা সংগঠক মমতা মণ্ডল, মীরা দাস, এআইইউটিইউসি-র সংগঠক নিখিল বেরা। সভা থেকে শ্যামলী মোশেলকে সভানেত্রী, উৎপলা মণ্ডলকে সম্পাদিকা ও মিনতি সিং-কে কোষাধ্যক্ষ করে উলুবেড়িয়া পৌরসভাকেন্দ্রিক একটি শক্তিশালী মিড ডে মিল কর্মী সংগঠন গড়ে তোলা হয়।

এগরায় পরিযায়ী শ্রমিকদের পথ অবরোধ

পূর্ব মেদিনীপুরে এগরা শহরের প্রধান বিশ্রামাগারটিকে পৌর প্রধানের অনুমতিক্রমে হরিণঘাটার মাংস ও দুধ ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে কয়েকশো পরিযায়ী শ্রমিকরা এগরা-বেলদা পাকা রাস্তা অবরোধ করে বিশ্রামাগারটিকে জনস্বার্থে ব্যবহার করার দাবি জানান। সমর্থনে এগরা পৌর নাগরিক কমিটি বিক্ষোভ ও অবস্থান সভা করেন। নেতৃত্বে ছিলেন নাগরিক কমিটির সহ-সভাপতি হরেন্দ্রনাথ মাইতি ও ডাক্তার এন কে প্রধান, সম্পাদক শিক্ষক জগদীশ সাউ, নিহাররঞ্জন খাটুয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ চৌধুরী, অনুপ প্রধান, অনুপ জানা, শ্যামাপদ দীক্ষিত, অপূর্ব ব্যানার্জী প্রমুখ।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া যাবে না ঃ এআইডিএসও

২০২১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাস ৩০-৩৫ শতাংশ কমানো প্রসঙ্গে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক বলেন, দায়িত্বশীল শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই সিলেবাস কমানো হয়েছে। ভাষা, সমাজবিজ্ঞান ও মৌলিক বিজ্ঞানের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাদ দেওয়া হয়েছে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

এর ফলে জয়েন্ট এন্ট্রান্স, নিট সহ নানা পরীক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হবে ছাত্রছাত্রীরা। করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে সিলেবাস কমানোর ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি কমালে কম ক্ষতি হত তা গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়নি। মৌলিক বিষয়গুলি বাদ দেওয়াও উচিত হয়নি। ডিএসও-র দাবি, ১) সিলেবাস পুনর্বিবেচনা করতে হবে, কোনও অজুহাতেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি বাদ দেওয়া চলবে না। ২) স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুলে পঠন-পাঠন শুরু করতে হবে। বোর্ড পরীক্ষার আগেই ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩) বোর্ড পরীক্ষার আগেই টেস্ট পরীক্ষা নিতে হবে। ৪) প্র্যাক্টিকাল ও ল্যাবরেটরি-নির্ভর বিষয়গুলির ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

জনবিরোধী কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবিতে অ্যাবেকার রাজভবন অভিযান

১৪ ডিসেম্বর কয়েকশো বিদ্যুৎ গ্রাহক সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে ধর্মতলায় পৌঁছান। সেখান থেকে এক প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের উদ্দেশে স্মারকলিপি দেন। তাতে অবিলম্বে নয়া কৃষি ও বিদ্যুৎ আইন প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের নবান্ন অভিযান

পশ্চিমবঙ্গের ১২৬টি পৌরসভায় কর্মরত ১০০০০ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী দীর্ঘ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর ধরে পৌর এলাকায় নামমাত্র বেতনে কাজ করে আসছেন। প্রতিটি শিশুর সুরক্ষা ও জননী সুরক্ষা সহ পতঙ্গবাহিত রোগের সচেতনতা এবং বর্তমানে করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। বর্তমানে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের কাজ এই পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়েই সরকার কার্যকর করছে। কিন্তু এই পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের দীর্ঘ ৯ বছর এই সরকারের জমানায় কোনও বেতন বৃদ্ধি হয়নি, নেই কোনও অবসরকালীন ভাতা।

১১ ডিসেম্বর পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা সকালেই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঘেরাও কর্মসূচি করে, তারপর নবান্ন অভিযান করে ধর্মতলায় অবরোধ করে। এক রাজ্য প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করতে যান। কালীঘাটের বাসভবনেই পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক কেকা পাল ও পৌলমী করনজাই দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে তুলে দিয়ে অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর, বেতন বৃদ্ধি ও তিন লক্ষ টাকা গ্র্যাচুয়িটির দাবি জানান। আন্দোলনের চাপে পরের দিন পৌরমন্ত্রী স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও অবসরকালীন ভাতা বিষয়ক নির্দেশনামা দ্রুত প্রকাশের আশ্বাস দেন।

পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভানেত্রী সুচেতা কুণ্ডু বলেন, সরকার অবিলম্বে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে নির্দেশনামা জারি না করলে আন্দোলন তীব্র হবে।

গৃহবধূর হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি

কোচবিহার সদরে লংকা বর পিলখানার এক গৃহবধূকে শারীরিক নির্যাতনের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। বধূর পরিবারের লোকজন ৭ জনের নামে ডায়েরি করলেও ৩ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। অবিলম্বে সমস্ত অপরাধীদের গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবিতে ৯ ডিসেম্বর এআইএমএসএসের পক্ষ থেকে শতাধিক মহিলা মিছিল করে এসপি অফিসে এবং মহিলা থানায় বিক্ষোভ দেখায়। ডিএসপি এবং আইও অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজ্যের কৃষকরাও সোচ্চার

একের পাতার পর

উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সংহতি জানায় বাঁকুড়া নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ, ডিএসও-র বাঁকুড়া জেলা কমিটি। সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড তারাশঙ্কর গোপের নেতৃত্বে ১০-১২ ডিসেম্বর মহকুমা শহর খাতড়ায় অপর একটি ধর্নামঞ্চ হয়। রানীবাঁধ, হীড়বাঁধ, খাতড়া, ইন্দপুরের কৃষকরা এতে যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন কমরেড মানিক মহাপাত্র, বৈদ্যনাথ মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল, সদানন্দ মণ্ডল সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব।

মুর্শিদাবাদ ঃ ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলার ১৫টি জায়গায় এবং ১৪ ডিসেম্বর আরও ৭টি জায়গায় ধর্না অনুষ্ঠিত হয়। ভগবানগোলা, সুতি, হরিহরপাড়া, ইসলামপুর, বেলডাঙ্গা, লোচনপুর, চোঁয়া, রানিনগর সহ সব ধর্নাস্থলেই কৃষক নেতারা আন্দোলনকে রাজপথ থেকে খেতেখামারে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। কৃষি আইনের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

পশ্চিম বর্ধমান ঃ ১০ ডিসেম্বর লাউদোহায় সারাদিনব্যাপী ধর্না চলে। ১৪ ডিসেম্বর আসানসোলের ধর্নায় সংহতি জানান গুরুদুয়ারা প্রবন্ধ কমিটির বার্নপুর শাখার সম্পাদক সুরেন্দ্র সিংহ ও সঞ্চালক পরমজিৎ সিং। সংহতি জানায় অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএসের পক্ষ থেকে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা শিপ্রা ভট্টাচার্য।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ১০-১২ ডিসেম্বর হাবড়ার ধর্নামঞ্চ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পরিমল হালদার। এই ধর্নায় প্রগ্রেস সায়েন্স ফোরামের পক্ষ থেকে সভাপতি পার্থ শিকদার ও অফিস সম্পাদক চয়নিকা দেবনাথ সংগঠনের বিশিষ্ট নেতা গোপাল বিশ্বাসকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান। ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বরে ধর্নায় বহু মানুষ যোগ দেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ জয়নগর ২ নং ব্লকের প্রিয়র মোড়ের

মেদিনীপুর শহর

ধর্নায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার। রায়দিঘী বাসস্ট্যান্ডে কয়েকদিন ধরে ধর্না হয়। ধোসা ও ভাঙড়েও ধর্না অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়া ঃ ২৮ নভেম্বর হাওড়ার বাগনানে কৃষকদের মিছিল ও প্রতিবাদী সভা হয়। ৬-৭ ডিসেম্বর বাগনান থানা এলাকায় ব্যাপক প্রচার করা হয়। ৭ ডিসেম্বর শ্যামপুর মাণ্ডিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১২ ডিসেম্বর ধর্না চলে উলুবেড়িয়া শহরে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাণকেন্দ্র শহরের কার্জন গেটে ১০ ডিসেম্বর ধর্নামঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। বীরভূম জেলার মুরারই, বোলপুর, সিউড়ি শহর ও সিউড়ি ২নং ব্লকে ধরনা হয়। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে কৃষক সংহতি মঞ্চের ধর্নায় বক্তব্য রাখেন কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ মৃদুল দাস সহ কৃষক নেতৃবৃন্দ। মঞ্চের পক্ষ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ডি এম দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে ৩ দিন ধরে ধর্না চলে। মেদিনীপুর শহরে ১০ ডিসেম্বর লাঙল হাতে বিক্ষোভ দেখায় এআইকেকেএমএস। দার্জিলিং-এর শিলিগুড়ি পোস্ট অফিস মোড়ে ধর্না হয়। শিবমন্দিরে ডিএসও-র পক্ষ থেকে মশাল মিছিল করা হয়। কোচবিহার শহরে ধর্নায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ ও এআইকেকেএমএসের নেতা কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মেখলিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডেও ধর্না হয়। আলিপুরদুয়ারে ডিএম অফিসের সামনে অবস্থানে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা তরণী রায়। জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়া মোড়ে ধর্না মঞ্চে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা হরিভক্ত সর্দার। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদীঘির দোমোহনায় ধর্নামঞ্চ হয়। মালদা জেলার গাজলের বিদ্রোহী মোড়ে ধর্না হয়। সর্বত্র নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের গণকমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী করার আহ্বান জানান।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ১০ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে লাঙল হাতে বিক্ষোভ দেখায় এআইকেকেএমএস। কৃষক ধর্নামঞ্চে কৃষক নেতাদের হাতে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধিত করেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি এবং এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি।

দার্জিলিং ঃ শিলিগুড়ি পোস্ট অফিস মোড়ে ধর্না হয়। শিবমন্দিরে ডিএসও-র পক্ষ থেকে মশাল মিছিল করা হয়।

কোচবিহার ঃ কোচবিহার শহরে ধর্নায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ ও কেকেএমএসের নেতা দেবেন্দ্রনাথ বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মেখলিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডেও ধর্না হয়।

উত্তর দিনাজপুর ঃ করণদীঘির দোমোহনায় ধর্নামঞ্চ হয়।

মালদা ঃ গাজলের বিদ্রোহী মোড়ে ধর্না হয়।

বাঁকুড়া

হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

কলকাতা

হাওড়া

রানিনগর, মুর্শিদাবাদ

লাউদোহা, পশ্চিম বর্ধমান

শিলিগুড়ি

জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মুরারই, বীরভূম

শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ

তিনের পাতার পর

বনাম হার্ডওয়ার্ক শিক্ষা'র তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ! আমাদেরদেশের তথাকথিত উন্নাসিক 'এলিটিস্ট' অংশের কিছু লোক এবং অধিকাংশ সরকারি মন্ত্রী-আমলারা ভাবেন— গরিব মানুষের ছেলেমেয়েদের এত লেখাপড়া ও উচ্চশিক্ষা দিয়ে অথবা ইংরেজি শিখে কী হবে? যেমনটি আমরা শুনেছিলাম ১৯৭৮-৭৯ সালে পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি এবং পাশফেল তুলে দেওয়ার সময় সিপিএমনেতারা বলতেন, 'চাষি মজুরের ছেলেদের এত ইংরেজি শিখে কী হবে? তাদের তো কোনও রকমে নিত্যদিনের কাজটা চালিয়ে নিতে পারার মতো শিক্ষা হলেই হল'।

বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার আগে এবং পরে সরকারি, জনসাধারণের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। সমাজ ও দেশের বিকাশ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু শিক্ষার সামগ্রিক বৃত্তিমুখীকরণের কথা ভারতীয় নবজাগরণের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীগণ অথবা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ স্বপ্নেও চিন্তা করেননি। বরং মানুষ গড়া, চরিত্রদান ও জ্ঞানার্জনের জন্য তারা বিভিন্ন স্কুল-কলেজের স্থাপনের কথা বলেছেন এবং প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান শাসকরা ঠিক উল্টো পথে চলেছেন! শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব অর্জন, চরিত্র নির্মাণ ও জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের তারা শিক্ষিত 'রোবট' বা 'মেকানিক' অথবা মিস্ত্রিতে পরিণত করতে চাইছেন। তাদের ভাবখানা এমন যেন দেশে প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে, অভাব শুধু সত্যিকারের কর্মক্ষম মানুষের? তাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০তে বৃত্তিমুখী শিক্ষার এত আয়োজন ও গুরুত্ব! কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থা অন্য কথা বলছে। সরকারি তথ্য অনুসারে প্রতি বছর গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, আইটিআই ও অন্যান্য অ্যাপ্রেনটিসশিপ কোর্সে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫০-৫৫ লক্ষ (সূত্র: সর্বভারতীয় উচ্চশিক্ষার সার্ভে রিপোর্ট ২০১৮-১৯) কিন্তু এই বৃত্তিমুখী ও পেশাগত শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ৭০ শতাংশেরও উপযুক্ত কাজ মেলে না! মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে ৬২১৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ রয়েছে। প্রতি বছর গড়ে ১৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে। কিন্তু এর মাত্র ২০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের পাঠ্য বিষয়ে চাকরি পেতে সক্ষম হয়। বর্তমান সরকারি হিসেব বলছে বিগত এক বছরে বেকার সমস্যা ৫০ বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে! সরকারি সূত্র অনুসারে বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের বাজার অর্থনীতি ভয়াবহ সংকটের করাল গ্রাসে উৎপাদন শিল্পের বিকাশ সূচক ঋণাত্মক। কৃষিও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে। এমনকি পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। জিডিপি একদম তলানিতে এসে ঠেকেছে। সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দ্রুত বেসরকারিকরণ হচ্ছে এবং বেসরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান ব্যাপক হারে কমছে। লে অফ, লকআউট, ছাঁটাই এবং কোনও নতুন কর্মী নিয়োগ না করার ফলে! অন্যদিকে বর্তমান শিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'পুঁজি প্রধান' যাতে আর্থিক বিনিয়োগ প্রচুর কিন্তু ন্যূনতম কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তাই সর্বত্রই কাজের হাহাকার।

তাই এই ভয়াবহ বেকার সমস্যা থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বৃত্তিমুখী শিক্ষার এই ঢাক পেটানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকার এ কথা ভালোভাবেই জানে যে এই বৃত্তি শিক্ষা নিয়ে ছাত্রসমাজ ভবিষ্যতে কোনও সরকারি বা বেসরকারি চাকরি পাবে না। আবার সরকারি বা বেসরকারি লোন নিয়ে (যদিও এটা জোগাড় করা সহজ নয়) কোনও কিছু করাটাও সহজ কাজ নয়! চূড়ান্ত অর্থনৈতিক ও ব্যাবসায়িক সংকটের যুগে কিছু হাতের কাজের ট্রেনিং নেওয়া ছাত্রছাত্রীরা কর্পোরেট ও বৃহৎ পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতা করে স্বাধীন ব্যবসা দাঁড় করাবে, তা কল্পনারও অতীত। বাস্তবতা হচ্ছে, মাটির বাসনের পরিবর্তে মানুষ ব্যবহার করে অ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টিল অথবা ক্রকারি। কামারের তৈরি জিনিস ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা অনেক সস্তায় দেবে। তাঁতি সস্তা মিলের কাপড়ের সাথে পেরে উঠবে না। মাটির পুতুল বা খেলনার পরিবর্তে এসেছে প্লাস্টিকের পুতুল ও চীনের সস্তার খেলনা। পুরানো ছুতোর মিস্ত্রি আধুনিক কর্পোরেট ফার্নিচার কোম্পানির সামনে টিকবে কী করে? এক কথায় বাজার অর্থনীতিতে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে ছোট হস্তশিল্পের টিকে থাকবার জায়গা নেই। দু-একটি ছোটখাটো পেশা যথা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, প্লাম্বার বা রাজমিস্ত্রির কাজেরক্ষেত্রে যখন লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বৃত্তিমুখী শিক্ষা নিয়ে বেরোবে তখন কাজ পাবে কোথায়? তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে আবাসন শিল্প ধুঁকছে, এটাই তো বাস্তব! গৃহস্থ বাড়িতে ক'জন কাজ পাবে? ফলে সরকার বাহাদুর ছাত্রদের বৃত্তি শিক্ষা দিয়ে বলবেন, বৃত্তি শিক্ষা নিয়েছ, এবার 'আত্মনির্ভর' হও! সরকারের কাছে চাকরির আশা না করে 'করে খাও' বা 'চরে খাও'। এ কথা কি আমরা ভুলে যেতে পারি যে, ইতিপূর্বে স্কুলে নবম-দশম শ্রেণীতে 'ওয়ার্ক এডুকেশন' শিক্ষা চূড়ান্ত ব্যর্থ ও প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এ তো শিক্ষার নামে চূড়ান্ত কপটতা!

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তিমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, তত্ত্বগত শিক্ষা বাদ দিয়ে বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে কেবল ব্যবহারিক দিকটা শেখানো। যার ফলে ছাত্রদের মধ্যে গড়ে উঠবে না সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংযোজিত করে সৃজনশীল জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কোনও সুযোগ। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অংকশাস্ত্র ও জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিজ্ঞানের যে সুনির্দিষ্ট যুক্তিধারা নিহিত আছে, ন্যায়নীতিবোধ ও দর্শনকে উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে, তাকে যদি অস্বীকার করা হয়, তা হলে কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান গড়ে উঠতে পারে মাত্র, কিন্তু শিক্ষাগত যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে তাতে যুক্তিবাদী মন, প্রজ্ঞা, সামগ্রিক মানবিক গুণাবলী বা সুকুমারবৃত্তি এবং এগুলিকে ভিত্তি করে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠন, কোনও কিছুই গড়ে উঠবে না। স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে আমাদের সরকার বারবার শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টাই নিয়েছে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল, মনুষ্যত্ব অর্জন, চরিত্র নির্মাণ ও জ্ঞানার্জন যা যথার্থ মানুষ গড়ে তোলে। কিন্তু নিছক বৃত্তিমুখী শিক্ষা তা দিতে পারে না। তাই মহান মানবতাবাদী বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই সময় এই প্রবণতা লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'একজন মানুষকে কোনও বিদ্যার বিশেষত্বের শিক্ষা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়, এর ফলে সে একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রে পরিণত হতে পারে, কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না। মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা এবং জীবনানুগ উপলব্ধি অর্জন করা ছাত্রদের পক্ষে অপরিহার্য। যা কিছু সুন্দর এবং নৈতিক দিক থেকে শুভ সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি তাকে অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে তার বিশেষত্বের জ্ঞান দিয়ে সে একটা 'সুশিক্ষিত কুকুরের' মতই গড়ে উঠবে, সর্বাঙ্গ বিকশিত মানুষের মত নয়'। এমনকি আমাদের দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলেছিলেন,- 'educated barbarians' অর্থাৎ 'শিক্ষিত বর্বর'। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মাধ্যমে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শিক্ষার সামগ্রিক বৃত্তিমুখীকরন করছেন তার পরিণতিতে আগামী প্রজন্ম হয় যুক্তিহীন 'যান্ত্রিক রোবট' না হলে 'সুশিক্ষিত কুকুর' অথবা 'শিক্ষিত বর্বর' এ পরিণত হবে! দেশের বড় অংশের শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মনে এই আশঙ্কাই আজ কাজ করছে। তাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষার সর্বনাশের কথা ভেবে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাপ্রেমী মানুষেরা জোটবদ্ধ হচ্ছেন 'অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি'র পতাকাতলে।

তথ্যসূত্র: ১) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ দলিল, ২) অভিরূপ গুপ্তের নিবন্ধ -আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩) সারাবাংলা সেভ এডুকেশন কমিটি প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত পুস্তিকা, ৪) অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত পুস্তিকা, ৫) আনন্দবাজার পত্রিকা: ১ ডিসেম্বর ২০২০ প্রস্তুতি পৃষ্ঠা। প্রস্তুতি পৃষ্ঠা।

আদানির কয়লাখনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অস্ট্রেলিয়ায়

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া একদিনের ম্যাচ চলাকালীন হঠাৎ ছন্দপতন— কিছু দর্শক মাঠে ঢুকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ভারতীয় পুঁজিপতি আদানির বিরুদ্ধে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মেলবোর্নেও ঘটেছে। দিল্লি অবরোধ করে কৃষকদের বিক্ষোভেও উঠে আসছে আদানি-আম্বানিদের লুঠের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ। সমুদ্রপারের অস্ট্রেলিয়াতেও বিক্ষোভ দেখল সারা বিশ্ব।

ভারতের মানুষের মনে পড়তে পারে, ২০১৪ সালে ভোটে জেতার পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আদানি কোম্পানির মালিককে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, অস্ট্রেলিয়ায় কয়লা ব্যবসার বরাত তাঁকে পাইয়ে দেওয়া। আদানিদের প্রচুর ঋণ বকেয়া থাকায় ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক এই প্রকল্পে টাকা ঢালতে রাজি ছিল না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্টেট ব্যাঙ্কের তৎকালীন সিইও বাধ্য হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় উড়ে গিয়ে ঋণ চুক্তিতে সই করে আসতে। সে টাকা শোধ হওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। এদিকে আদানি গোষ্ঠী সে দেশের কাঁচামাল ও শ্রমশক্তি কাজে লাগিয়ে বিপুল মুনাফা করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। এর বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র জোরালো প্রতিবাদ উঠেছে, লাগাতার বিক্ষোভে স্লোগান উঠেছে 'স্টপ আদানি', 'আদানি গো হোম'।

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে আদানি কারমাইকেল কয়লাখনি গড়ার পরিকল্পনা করেছে। এতে দেড় হাজারের বেশি চাকরি এবং কয়লাখনি ও রেল প্রকল্পের জন্য ৭৯০০ কোটি টাকা চুক্তির ঘোষণা করেছে তারা। ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু বাজার দখলের আশায় আছে অস্ট্রেলিয়ার একচেটিয়া মালিকরা। তাই অস্ট্রেলিয়া সরকার আদানি গোষ্ঠীকে অবাধে ছাড় দিচ্ছে নানা ক্ষেত্রে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝছেন, সামান্য কর্মসংস্থানের লোভ দেখিয়ে ক্ষতিই হবে ব্যাপক। বিশেষজ্ঞদের মত, খনি থেকে তোলা কয়লা থেকে ৪.৬ বিলিয়ন টন বিষাক্ত কার্বন নির্গত হয়ে বাতাসে মিশবে। মানবশরীর ছাড়াও ব্যাপক ক্ষতি হবে কৃষি, জল ও পরিবেশের। কয়লাখনির দূষণে বিশ্বের অন্যতম বিশাল প্রবাল প্রাচীর (গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ) ধ্বংস হয়ে যাবে, বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটবে এবং স্থানীয় বেশ কিছু প্রজাতির উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে প্রবল বিক্ষোভে নেমে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। এ ছাড়াও এই প্রকল্পের জন্য আদানি গোষ্ঠী সাত্তর নদী থেকে বছরে ১২.৫ বিলিয়ন লিটার জল এবং গ্রেট আর্টেসিয়ান বেসিন থেকে অফুরন্ত জল তোলার লাইসেন্স পাওয়ায় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশবিদরা ছাড়াও নানা শহরে দেশের অসংখ্য মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। আদানিকে জল তোলার লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলাও ঠুকেছে স্থানীয় একটি সংস্থা।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি কীভাবে নিজের দেশ এবং অপর দেশের মানুষকে লুঠ করে— এ তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

এ বছর ৮৯টির বেশি শিল্প দুর্ঘটনা গুজরাটে
শ্রমিকদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেই

শিল্প দুর্ঘটনায় গুজরাট প্রথম সারিতে। বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে মালিক শ্রেণির শিল্প আইন মানার কোনও বালাই নেই। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকমতো আছে কি না সরকারের পক্ষ থেকে তার কোনও নজরদারি নেই। কোনও মালিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি রাখলে সরকারের পক্ষ থেকে শাস্তি প্রদানের কোনও উদ্যোগ নেই। ফলে গুজরাটে বেড়েই চলেছে উত্তরোত্তর শিল্প দুর্ঘটনা। সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ভাটবা রাসায়নিক শিল্পাঞ্চলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। গুজরাট থেকে জয়েশ প্যাটেল জানিয়েছেন, এখানে ৩টি কারখানা পুড়ে যায়। প্রথমে মাতাঙ্গি শিল্পাঞ্চলে আগুন লাগে। পরে তা সংলগ্ন দুটি কারখানা জগসন ও ভাবিনে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের ভয়াবহতা এত তীব্র ছিল যে, ১০০ জন ফায়ার ব্রিগেড কর্মীর ১০ ঘন্টারও বেশি সময় লেগে যায় নিয়ন্ত্রণে আনতে।

তিনি জানান, এ বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যে ৮৯টি শিল্প দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং ১৩০ এর বেশি শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি এবং এসইউসিআই (সি) এর পক্ষ থেকে ১১ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মালিক ও সরকার পক্ষের ত্রুটিগুলি তুলে ধরে অবিলম্বে তা দূর করার দাবি জানানো হয়েছে।

সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে
গ্রিসের শ্রমিকরা ধর্মঘটে

দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে এ দেশের মতো গ্রিসের সরকারও একের পর এক আক্রমণ চালাচ্ছে খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সেখানকার 'অল ওয়ার্কার্স মিলিট্যান্ট ফ্রন্ট'-এর আহ্বানে ২৬ নভেম্বর দেশজোড়া ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন গ্রিসের শ্রমিক-কর্মচারীরা। এথেন্স, প্যাট্রাস সহ দেশের বড়-ছোট শহরে করোনাজনিত নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার মানুষ সেদিন পথে নেমেছিলেন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায়। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মানুষ-মারা নয়া আইনগুলির প্রতিবাদে শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা ধর্মঘটে ওইদিন গোটা ভারতও ছিল স্তব্ধ।

বৃহৎ পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে গ্রিস সরকার সম্প্রতি সংসদে নতুন বিল এনেছে। সেখানে ৮ ঘন্টার মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের ওপর দৈনিক ১০ ঘন্টার কাজ চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বলা হয়েছে, রবিবারেও ছুটি থাকবে না। পরিবহণ ব্যবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থাগুলি ব্যবসা করার জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি মালিকদের হাতে।

দীর্ঘদিন ধরেই আইএমএফ সহ সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক সংস্থাগুলির নির্দেশে বিপুল ঋণগ্রস্ত গ্রিসের সরকার ব্যয়সঙ্কোচের পথে হাঁটছে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। তার ওপর এসে পড়েছে করোনা অতিমারির ধাক্কা। এই অবস্থায় মুনাফা লুটেরা পুঁজিমালিকরা শ্রমিকদের শেষ রক্তবিন্দুটুকু নিংড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। গ্রিসের সরকার সেই কাজে তাদের সহায়তা করতেই এই শ্রমিকবিরোধী আইন আনার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, যার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে সেখানকার শ্রমিক সমাজ। এদিনের ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিক-কর্মচারীরা। সামিল ছিল হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ফেডারেশনগুলি। ছিলেন নির্মাণকর্মী, ওষুধ কারখানার কর্মচারী, দ্বীপবহুল এই দেশের নৌবিভাগে কর্মরত মানুষজন।

অল ওয়ার্কার্স মিলিট্যান্ট ফ্রন্টের দাবি, দেশের সমস্ত কর্মহীন মানুষের জন্য উপযুক্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা, অতিমারিতে যাদের কাজ চলে গেছে, তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া এবং সমস্ত শ্রম-অধিকারগুলি বজায় রাখা। এছাড়া কোয়ারান্টাইনে থাকা কর্মচারীদের জন্য বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনামূল্যে দেওয়ারও দাবি করেছে তারা সরকারের কাছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা বৃদ্ধি করে ডাক্তার ও নার্সদের জন্য ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ১১ ডিসেম্বর, '২০)

সরকারি নির্দেশিকার প্রতিবাদ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর সম্প্রতি এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলি রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিকে ব্যবহার করতে পারবে। এর জন্য দরপত্রও আহ্বান করা হয়েছে। সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।

তিনি বলেন, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি)-র সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি হাসপাতালগুলিকে কর্পোরেট মেডিকেল শিক্ষা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর দ্বারা ব্যয়বহুল বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষা উৎসাহ পাবে। পাশাপাশি, সরকারি হাসপাতালগুলির কর্তৃত্ব কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। সরকারি চিকিৎসার সুযোগ কমতে কমতে এখনও যতটুকু আছে, তাও সঙ্কুচিত হবে। ডাঃ বিশ্বাস বলেন, রাজ্য সরকারকে এই জনবিরোধী এনএমসি আইন প্রয়োগে বিরত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।

জীবনাবসান

দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রবীণ নেতা কমরেড জসীমউদ্দিন আহমেদ দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২৫ নভেম্বর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। বেশ কিছুদিন থেকেই তিনি নানা রোগে ভুগছিলেন।

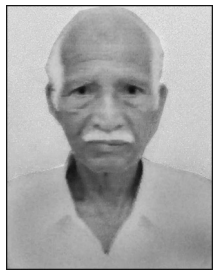

বিগত সাতের দশকে কমরেড শিবদাস ঘোষের চাষি আন্দোলন প্রসঙ্গে বই পড়ে তিনি এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ধীরে ধীরে দলের কাজ শুরু করেন। তারপর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হওয়ার সুবাদে এলাকায় তিনি মাস্টারমশাই নামে পরিচিত ছিলেন। শিক্ষা আন্দোলনের সাথেও তিনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন বিপিটিএ-র আজীবন সদস্য ছিলেন। সাতের দশকে তৎকালীন সিপিএম সরকারের প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে এবং আন্দোলনের ধারায় গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজ উদ্যোগে এলাকায় তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্র চালাতেন। পড়াশোনায় ও তত্ত্বচর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল। সততা, নিষ্ঠা, দরদি মন তাঁকে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড় করিয়েছিল। এভাবেই তিনি রাজগঞ্জ থানার প্রায় সমস্ত গ্রামের জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু এলাকার মানুষ এবং কমরেডদের মনে গভীর বেদনার ছাপ ফেলেছে।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তপন ভৌমিক ও কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য সহ রাজগঞ্জের কমরেডরা ও গুণমুগ্ধ জনগণ। রক্তপতাকা দিয়ে তাঁকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তপন ভৌমিক ও গৌতম ভট্টাচার্য। সমস্ত কমরেডরা পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড জসীমউদ্দিন আহমেদ লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গিলেরছাট সাংগঠনিক লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড বিজয়কৃষ্ণ হালদার ১৯ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

দলের নেতৃত্বে ভেস্টেড ও বেনাম জমি উদ্ধারের আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে প্রয়াত কমরেড বিজয়কৃষ্ণ হালদার দলের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীতে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে নিজেকে দলের কর্মী হিসাবে গড়ে তোলেন এবং দলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন।

তিনি গরিব মানুষদের সাথে সহজে মেলা-মেশা করতে পারতেন। পুরো পরিবারকে দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করে গেছেন। ছোটদের নেতৃত্বে কাজ করতে তাঁর অসুবিধা হত না।

তিনি শিক্ষা সংগঠন এসটিইএ-র নেতৃত্বে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের পক্ষ থেকে জেলা পরিষদ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছিলেন। তিনি খাঁড়াপাড়া হাইস্কুল, করালীরচক হাইস্কুল, বামাচরণ বিদ্যাপীঠ এবং খাড়ী কো-অপারেটিভের ডাইরেক্টর বডির পূর্বতন সদস্য ছিলেন। কমরেড বিজয়কৃষ্ণ হালদারের মৃত্যুতে দল একজন সংগঠককে হারাল।

প্রয়াত কমরেড বিজয়কৃষ্ণ হালদার লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে দেশজুড়ে সংহতি

উত্তর লখিমপুর, আসাম

ভিওয়ানি, হরিয়ানা

শাহজাহানপুরে রাস্তা অবরোধ

জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ

আগরতলা, ত্রিপুরা

হরিয়ানা-দিল্লি টিকরি সীমান্ত

“দাবি আদায় না করে ঘরে ফিরব না”

আন্দোলন মানুষকে দৃঢ়তা দেয়, ইজ্জতের সন্ধান দেয়। কথাটা জানা ছিল। এই জানা কথাটাই মূর্ত রূপ নিয়ে দেখা দিল দিল্লির সীমান্ত সিংঘুতে। না হলে ভাঙা পা নিয়েও ১৮ দিন খোলা মাঠে বসে আছেন প্রৌঢ়া কিষাণ রমণী! কিসের জোরে? মিছিল করার অপরাধে বিজেপি সরকারের পুলিশ লাঠির বাড়ি মেরে তাঁর পা ভেঙে দিয়েছে। ঘরে ফিরে যাওয়া দূরে থাক— দৃঢ়তার সাথে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, জিতে তবে ফিরব।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসা শিবির চলছে সেখানে। ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীরা খোঁজ নিচ্ছেন সকলের। এক জুনিয়র চিকিৎসক প্রশ্ন করেছিলেন ৭৫ বছরের অজিত কৌরকে — “মা, আপনি পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছেন। ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন নাকি?” যেন গর্জে উঠলেন বৃদ্ধা। হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকে তাঁর ঘোষণা— “দাবি আদায় না করে কেউ আমাকে ঘরে ফেরাতে পারবে না”।

আর এক তরুণ হরবিন্দর সিংহ। শরীর তাঁর অসুস্থ। নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। কিছু ওষুধ এনেছিলেন, তাও শেষ হয়ে গেছে। চিকিৎসকরা উদ্বিগ্ন। হরবিন্দরের ঘোষণা— “মরি মরব, লড়াই শেষ না করে ঘরে ফিরব কী করে!”

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কেরালায় বিশাল মিছিল

কেরালার তিরুবনন্তপুরমে দলের নেতৃত্বে বিশাল বাইক মিছিল। ১১ ডিসেম্বর

চণ্ডীগড়ে ‘ভগৎ সিং ভবন’ উদ্বোধন

৬ ডিসেম্বর চণ্ডীগড়ের মোহালিতে এ আই ডি ওয়াই ও-র কার্যালয় ‘ভগৎ সিং ভবনে’র উদ্বোধন করলেন এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। চণ্ডীগড় এবং পাঞ্জাবের কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও শুভানুধ্যায়ীদের অকুণ্ঠ সাহায্যে সীমিত সাংগঠনিক শক্তির মধ্যেও এই ভবন তৈরি সম্ভব হতে পেরেছে। কমরেড সত্যবান ভগৎ সিংয়ের জীবনসংগ্রাম তুলে ধরে উপস্থিত যুবকদের কাছে এ আই ডি ওয়াই ও-র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এ আই ডি ওয়াই ও-র চণ্ডীগড়-পাঞ্জাবের অফিস সম্পাদক কমরেড অমিত কুমার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কমরেড সত্যবান

ট্রেন রুট তুলে দেওয়া শুরু করল বিজেপি সরকার

উত্তর রেলের এগারোটি ট্রেন লাইন স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রেল দপ্তর। রেল পরিষেবাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয় এই অজুহাতে ১০ ডিসেম্বর ১১টি লাইন পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যেসব লাইনে অর্থনৈতিকভাবে লাভ হয় না সেগুলি একের পর এক বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং ছোট স্টেশনে বেশিরভাগ ট্রেন দাঁড়াবে না। কিছু স্টেশনও বন্ধ হবে। এই প্রক্রিয়ায় আগামী দিনে আরও বহু রেললাইন ও ছোট স্টেশনে কোপ পড়বে। অথচ এই জরুরি পরিষেবা দিতে সরকার ভারতীয় জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। সেই জন্য বহু দুর্গম এলাকায় অর্থনৈতিকভাবে লাভ না হওয়া সত্ত্বেও ট্রেন চালানো হয়। কিন্তু আগামী দিনে এইসব এলাকায় আর কোনও ট্রেন চলবে না। সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধার আর কোনও তোয়াক্কাই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার করছে না।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর তীব্র বিরোধিতা করেছে। বিরোধিতা করেছে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com